জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র : এসো মুক্ত করো

কেয়া সেন

প্রগতিশীল মার্কসীয় লেখক ও শিল্পীগোষ্ঠী যাঁরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্যাসিবাদ বিরোধিতার পথে অগ্রসর হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম সুরকার এবং সফল সংগীত শিল্পী। খুব বেশি কবিতা তিনি লেখেননি, কিন্তু ও অল্প সংখ্যক কবিতাই গণমানসের প্রগতিশীল চেতনার প্রতি আস্থাবান করে ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। তিনি যে সময়ে কবিতা লেখেন সেই সময়টা খুব একটা সুখের সময় ছিল না। বিদেশি শাসনের ভয়াবহতা মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে। জাপানি আক্রমণের আতঙ্কে কলকাতা আতঙ্কিত, চলেছে বিদেশি সৈন্যদের রক্তচক্ষু টহল। এরই পাশাপাশি মানুষ মারার ষড়যন্ত্রমূলক ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ। আবার জাতীয় আন্দোলন তখন চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। আর এরই সঙ্গে চলেছে সমান্তরালভাবে ফ্যাসিস্ট বিরোধী আন্দোলন, প্রগতি সাহিত্য আর গণনাট্য আন্দোলন। এই বিক্ষুব্ধ, আলোড়িত ও বেদনার্ত সময়ের একজন অন্যতম সংগঠক ও নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। তিনি শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যেমন প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন তেমনি প্রগতি সাহিত্য ও গণনাট্য সংঘের নানা কর্মকাণ্ডের অন্যতম শরিক ছিলেন।

বর্তমান বাংলাদেশের পাবনা জেলার অন্তর্গত 'শিতলাই" -এর জমিদার যোগেন্দ্রনাথ মৈত্রের তৃতীয় পুত্র জ্যোতিরিন্দ্র ১৯১১ সালের ১৮ই নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। মায়ের নাম ছিল সরলাদেবী, তিনি ছিলনে শ্রীরামপুরের রাজা কিশোরীলাল গোস্বামীর কন্যা। পাবনা জেলা স্কুলে বাল্য শিক্ষার সূচনা হলেও পরবর্তী পড়াশুনার জন্য কলকাতা চলে আসেন। রসায়ন শাস্ত্রে সান্মানিক স্নাতক হয়ে ভর্তি হয়েছিলেন কলকাতা মেডিকেল কলেজে। কিন্তু সাহিত্যপাঠের প্রতি তীব্র আকর্ষণে জ্যোতিরিন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজীতে অন্যতম সহপাঠী ছিলেন। কবি বিষ্ণু দে জ্যোতিরিন্দ্রের অন্যতম সহপাঠী ছিলেন। পারিবারিক যোগাযোগের কারণে শৈশবেই তিনি রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। এছাড়াও আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মহাত্মা গান্ধীর মতো জাতীয় আন্দোলনের শীর্ষনেতৃত্বের সংস্পর্শে এসে তিনি অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। তাঁর শিল্পীসত্তার বিকাশ ঘটে শৈশবেই। গাইতেন রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত প্রমুখের গান। শাস্ত্রীয় সংগীতের তালিম নিয়েছিলেন হরিচরণ চক্রবর্তী, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় ও কাশীনাথ চট্টোপাধায়ের কাছে। রবীন্দ্রনাথের গান শেখেন সরলাদেবী, ইন্দিরা দেবী ও দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে।

কলেজে পড়ার সময় থেকে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র কবিতা লেখা শুরু করেন। সে সময় তিনি মূলত মিলন বিরহের কবিতাই লিখতেন। বন্ধু বিষ্ণু দে-র মাধ্যমে পরিচয় গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে ওঠে। কবিতা পত্রিকাতেও লেখা প্রকাশিত হত। ১৯৩৭-৩৮ থেকে ফ্যাসিবাদ বিরোধী প্রগতি আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লে কবিতার ধরন বদলে যায়। মার্কসীয় দর্শনের প্রভাব পড়ে কবির মনোজগতে। তাঁর কবিতার সম্ভারে গানের সংখ্যা ছিল অনেক। 'অগ্রণী" পত্রিকায় জ্যোতিরিন্দ্র 'ত্রিশঙ্কু" ছদ্মনামে লিখতেন। তাছাড়া তাঁর বটুক ডাক নামটি বন্ধুমহলে বিশেষ পরিচিত ছিল। 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি" এবং 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' (যা ১৯৪৫ সালের পর প্রগতি লেখক সংঘ নামে পরিচিত) দুটি প্রতিষ্ঠানের দপ্তরে ৪৬ নম্বর ধর্মতলার আড্ডায় বন্ধু কবি বিনয় রায়-এর সঙ্গে আসা যাওয়া শুরু করেন জ্যোতিরিন্দ্র। তাঁর কথায় 'যেমন বিষ্ণু আমাকে হাত ধরে 'পরিচয়ের" আড্ডায় নিয়ে গিয়েছিল, তেমনই বিনয় আমাকে হাত ধরে এনে তুললো ৪৬ নম্বর ধর্মতলায়। নদী কখনো সোজা কখনো এঁকে বেঁকে ছুটছিল, এইবার সাগরে পড়ল।" ৪৬ নম্বর -এর আলোচনা প্রসঙ্গে Y.C.I. ('ইয়ুথস্ কালচারাল ইনস্টিটিউট'ঃ-এর শেষ পর্বে সমবেত সংগীতের যে রেওয়াজ শুরু হয়েছিল তার উল্লেখ করতে হয়। বিনয় রায়ের পরিচালনায় দেবব্রত বিশ্বাস, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র সহ আরও অনেকে সুরের আগুন লাগিয়ে দিত উপস্থিত সকলের মনেই। এই ৪৬ নম্বরের আড্ডায় প্রতি বুধবার সাহিত্য বৈঠক হত। সেখানে গল্প ও কবিতা পাঠ হত। বাঙলা সাহিত্যের অনেক বিদগ্ধব্যক্তির বহু বিখ্যাত রচনা প্রথম পাঠ হয়েছে এই বুধবারের বৈঠকে। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র কখনো গান গেয়ে কখনো বা কবিতা পড়ে এতে যোগ দিতেন স্বমহিমায়। এমনকি ১৯৪৪ সালে 'পরিচয়" পত্রিকার দপ্তর উঠে আসে ৪৬ নম্বর ধর্মতলায়। বলা যায় জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের সাহিত্য জীবনের অনেকটা অংশ জুড়ে ৪৬ নম্বরের প্রভাব রয়েছে।

১৯৪২ সালে 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' গড়ে ওঠে। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র সূচনা লগ্নেই এই সংগঠনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠেন। স্থির হয় নিখিল ভারত প্রগতি সংঘের শাখা হিসেবে এই সংগঠন কাজ করবে। ১৯৪৩ সালের মে মাসে (২৯শে মে) বম্বে সম্মেলনে গঠিত হয় 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'। এই সংঘের প্রতিষ্ঠালগ্নে জ্যোতিরিন্দ্র ছিলেন অন্যতম সংগঠক। কলকাতার সঙ্গে সমানভাবে যুক্ত থেকেছেন গণনাট্য সংঘের কেন্দ্রীয় কমিটির 'আন্ধেরি' (বোম্বাই) কমিউনে। কমিউনিস্ট পার্টির উপর নিষেধাজ্ঞা উঠে যায় ১৯৪১ সালে। পার্টির নির্দেশ মেনে জ্যোতিরিন্দ্র বিনয় রায় ও দেবব্রত বিশ্বাসের সঙ্গে ট্রামওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সদস্যদের গান শেখাতেন। গান শেখানোর সূত্রেই হাওড়া ময়দানে রেল শ্রমিক এবং চাঁপদানিতে চটকল মজুরদের কাছে অনেকবার যাতায়াত করেছেন তিনি। শ্রমিক-কৃষক সাধারণ মানুষের কাছে যাতায়াতের ফলে পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়ায় জ্যোতিরিন্দ্র বলেছেন, 'আমাদের সংস্কৃতিক গুণগত ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গেছে।'

গণনাট্যের কর্মীরা প্রথম থেকেই সারা দেশ জুড়ে প্রগতিশীল শিল্পনাট্যের প্রচার করতেন। সামাজিক দায়-দায়িত্বও এই সংঘের শিল্পীরা পালন করেছেন। (দুর্ভিক্ষের সময় People's Relief Committe কে ত্রাণকার্যে সাহায্য করার জন্য গণনাট্য সংঘ নানান জায়গায় ঘুরে ঘুরে অনুষ্ঠান করতেন এবং অর্থ সংগ্রহ করতেন। বাছাই করা শিল্পী ও গায়কদের নিয়ে Voice of Bengal গ্রুপ গঠন করা হয়। উদয়শংকরের পরিচালনায় Spirit of India নৃত্যনাট্য তৈরি হয়। নবান্ন নাটকের ৪০ টি অভিনয়

সে সময় হয়। কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্তদের বঞ্চনার ও শোষণের দিক রঙ্গমঞ্চে প্রথম উপস্থাপিত হয়। গণনাট্য সংঘের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ডে মানুষের বাঁচার জন্য নিরন্তর লড়াই এবং উত্তীর্ণ হওয়ার যে পথ তা নির্দেশ করার চেষ্টা হয়েছিল। তেভাগা আন্দোলন থেকে শুরু করে প্রতিটি গণ-আন্দোলনেই গণনাট্য সংঘ সাধারণ মানুষের পাশে থেকেছে। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের কথায় 'ভারতের সংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এ এক অতি উল্লেখযোগ্য ঘটনা— এই প্রথম মাতৃভূমি ও সাধারণ মানুষকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ ঘটল।'

গণনাট্য সংঘের গীতিকারেরা সমগ্র চল্লিশের দশক জুড়ে সাম্যবাদী সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবেই গান বাঁধতেন। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রও ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য গণনাট্য সংঘের সংঘ সঙ্গীত 'এসে মুক্ত করো' গানটি তাঁরই রচনা শিল্পের সাথে তিনি সাহিত্যকেও হাতিয়ার করে অসহায় মানুষের মুক্তির আন্দোলনের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকারে মার্কসবাদকেই পাথেয় করেছিলেন। প্রত্যক্ষ শ্রমিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রকে একাজে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল।

বর্তমানকালের কবিতার পাঠক যদিও জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের কাব্যজীবন নিয়ে খুব একটা আগ্রহী নন তবুও বাঙলা কবিতার ইতিহাসে তাঁর দুটি সৃষ্টি কর্ম স্মরণীয় হয়ে আছে। প্রথমটি হল দীর্ঘ কবিতা 'মধুবংশীর গলি'। ১৯৪৩-এর শেষের দিকে রচিত কবিতাটিতে তিনি নগরবাসী এক সাধারণ মানুষের প্রেম, নৈরাশ্য, সমাজ জিজ্ঞাসা, ক্রোধ আর বিপ্লবের স্বপ্নের বাণী শুনিয়েছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দিনগুলিতে কলকাতা নগরীর অভ্যন্তর উদ্‌ঘাটিত হয়েছে কবিতাটিতে। 'মধুবংশীয় গলি' নামেই প্রথম কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ -এর একেবারে শেষে। দ্বিতীয়টি হল মন্বন্তরের অভিজ্ঞতার আঘাতে রচিত তাঁর অপেরাধর্মী গীতি সংকলন 'নবজীবনের গান'। প্রকাশ পায় ১৯৪৫ -এ। আরেকটি কাব্যগ্রন্থ 'যে পথেই যাও' ১৯৭৩ -এ প্রকাশিত হয়েছিল এছাড়াও প্রকাশ পেয়েছে অগ্রন্থিত ছড়া ও কবিতা।

'মধুবংশীর গলি'' কাব্যটিকে চল্লিশের দশকের এক জীবন্ত দলিল বলা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কলকাতার ভয়ঙ্কর ছবি তুলে ধরা হয়েছে। মার্কিন কাপ্তেনদের লোলুপ দৃষ্টি, মন্বন্তরের সময় কীভাবে এক শ্রেণির বণিক নিজেদের মুনাফা পাহাড় প্রমাণ উচ্চতায় বাড়িয়ে তুলতে মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়েছিলেন তার ছবি রয়েছে। রয়েছে ক্ষুধার্ত মানুষের খিদের জ্বালায় লেক মার্কেটের দিকে যাত্রার ছবি। সামাজিক নানা অবক্ষয় ও ব্যভিচারের ছবি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন মধুবংশীর গলি কাব্যে। এই কাব্যে 'স্বস্তিবাচন'' কবিতায় কালোবাজারীদের ছবি এঁকেছেন তিনি—

'মর্মর-মূক মার্কিনী ঢং মুখে
ছায়ায় কায়ায় তেজারতি কারবার।
স্মৃতি কুট্টিম মূর্তিতে ঠাসাঠাসি;
প্রবল কামন আসে যায় বার বার।
প্রজ্ঞা - ঠকানো শুক্ল রাতের নিচে,
অগভীর মুখ ছায়াদের কাছাকাছি।
পুতুল - নাচের প্রেম নিবেদন মিছে;
নিষ্ফল শুধু কঙ্কাল বাছাবাছি।'

সমস্যাকে শুধু জনসমক্ষে তুলে ধরেননি। একজন কমিউনিস্ট কবি হিসেবে সমস্যা উত্তরণের পথ অন্বেষণের চেষ্টা করেছেন। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র জানতেন এই দুর্বিপাক বিনষ্ট করে দিতে পারে কুলপ্লাবী অন্নরিক্ত মানুষের সংগঠনকে। শোষিত মানুষ যদি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন তাহলে সমস্ত মারণলীলার অবসান ঘটতে পারে। তাই তিনি চেয়েছেন এমন একজন পেশীবান মানুষ যিনি 'শ্রমে শুদ্ধ'' এবং সমস্ত অন্যায়ের প্রতিবাদে রুখে দাঁড়াতে পারেন।

'এই দুর্বিপাকে
শ্রমে মুক্ত, শ্রমে শুদ্ধ পেশীবান মানুষকে চাই,
অন্যায়ের রক্তে স্নাত, সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।
করুণ - কঠিন মাটি পবিত্র বস্তুর আজ পেয়েছি সন্ধান
নির্ভীক প্রতিষ্ঠা চাই ইতিহাস-সম্মত কালের পাহাড়ে।'

[একটি প্রেমের কবিতা/ মধুবংশীর গলি]

আবার জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র শোষিত নিপীড়িত মানুষের সংগ্রামী চেতনার মধ্যে 'লাল ঐক্যের' নিশানা দেখেছেন। পেয়েছেন বুর্জোয়াদের সমস্ত নিরেট দেওয়াল ভাঙার মন্ত্র। শুনেছেন বিশ্বের সমস্ত নির্যাতিতের মুক্তির পদধ্বনি। 'নগর সংকীর্তন' কবিতায় তিনি লেখেন—

'কাখানায়
কারখানায়,
বিশ্বকর্মা হুশিয়ার আজ
সঙীন শানায়,
ব্যোমযান ভেদী বজ্র গড়ে
একাগ্র মনে।

আমাদের তবে মুক্তি মন্ত্র পড়ে।

আমাদের আর ভুল করবার অবসর নেই।
আমাদের মুক্তি, জেনো,
বিশ্বের মুক্তি,
সব নির্যাতিতের মুক্তি
দানবের হাত থেকে।'

'মধুবংশীর গলি" নামক কাব্যের নাম কবিতায় কবির রাজনৈতিক ভাবনার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে। সমসাময়িক কলকাতা সহ বঙ্গের ছবি তুলে ধরতে চেয়েছেন কবি জ্যোতিরিন্দ্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার আতঙ্কে কীভাবে মানুষের দিন চলে। কখনো কখনো রাজপথে মিলিটারি লরির ঘর্ঘর শব্দ শোনা যায়। কখনো আবার বোমা ফেলার আশঙ্কায় ভীত হয়ে ওঠে মানুষ। এ সবের পাশাপাশি কবি সেই ছবিও তুলে ধরতে ভোলেননি যেখানে ফ্যাসিস্ট বিরোধী মানুষ শ্লোগান দিতে দিতে বিদ্রোহের শাণিত বাণী শোনায়—

'মুক্ত প্রাণে মুক্ত ইচ্ছার সিন্দুকে তালা পড়ে,
শ্লোগান মুখী মন শানানো সঙ্গীনের মত ঝলক দিয়ে ওঠে,
ফ্যাসিস্ট বিরোধী সঙ্ঘে যোগ দেয়,'

এই দীর্ঘ কবিতায় কবি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র খণ্ড খণ্ড বহু চিত্রই তুলে ধরতে চেয়েছেন।
প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে সঙ্গী করে কীভাবে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করা হয়েছে। অনাহারে লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যু বরণ করেছে। জাপানি আক্রমণের ভয়ঙ্কর রণ-দামামার কথা এই কবিতায় রয়েছে এত বিপর্যয়ের ছবি থাকলেও একজন কমিউনিস্ট কবির আশাবাদী মনের ছবিও আমরা এই কবিতায় দেখতে পাই। তিনি স্বপ্ন দেখেছেন নতুন সমাজ গঠনের। যেখানে মার্কসীয় দৃষ্টিতে শোষিত মানুষের সংগ্রামী চেতনার মধ্যে বুর্জোয়াদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে স্থাপিত হবে 'লাল ঐক্যের নিশানা'—

'হে নবীন, হে প্রবীণ, মজদুর, ওহে কৃষাণ
ওহে মোটা সোটা বেঁটে, খেটে খাওয়া কেরানীদল,
হে কাব্য পাওয়া পলাতক ক্ষীণ কবির দল,
শিল্পী দল,
হে ধনিক, হে বণিক, আর্য, অনার্য
করো শিরোধার্য—
বৃদ্ধযুগের গলিত শবের পাশে
প্রাণ কল্লোলে ঐ নবযুগ আসে।
প্রস্তুত করো তোমাদের সেই সব দিনগুলির জন্য
যখন প্রত্যেক সূর্যোদয়ে পাবে নবজীবনের স্তোত্র,'

নব যুগ আসার স্বপ্ন কবি জ্যোতিরিন্দ্র দেখেছেন চিন, মস্কো এবং টিউনেসিয়া থেকে—

'স্বপ্ন জেগে উঠেছে, উঠেছে
স্টালিনগ্রাদে, মস্কোভায়, টিউনিশিয়ায়,
মহাচীনে।
মহা আশ্বাসের প্রবল নিশ্বাসে
দুর্দমনীয় ঝড় উঠেছে সৃষ্টির ইশান কোণে।'

'নবজীবনের গান' কাবের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র সর্বহারা শ্রমজীবী শ্রেণির মানুষের জয়গান গেয়েছেন। ইতিমধ্যে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতেও সমাজতন্ত্র নতুন আলো নিশানা দেখাচ্ছে। ভারতবাসীর দুঃখ দুর্দশা ঘুচে যেতে পারে সমাজতন্ত্রের পথে, তাই 'নবজীবনের গান' কবিতায় তিনি বলেন—

'অভয় পেয়েছি নতুন দিনের কাছে
দিকে দিকে তাই আশার পতাকা নাচে,
পেশীতে পেশীতে রক্তের লাল আলো,
মুছে দেবে আমাবস্যার যত কালো—'

নতুন সমাজ গঠনের রূপকারের প্রতিও জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। যিনি অন্ধকারের গ্লানিকে, বন্ধনের কান্নাকে শৃঙ্খলের যন্ত্রণাকে দূরে সরিয়ে বাঁচার নতুন ঠিকানা দেখিয়েছেন—

'দিকে দিকে ভেঙেছে যে শৃঙ্খল
দূর্গত দলিতেরা পায় বল।
এ শুভ লগ্নে তাই তোমাকে স্মরণ করি রূপকার
এসো মুক্ত করো হে এই দ্বার।'

'নবজীবনের গান' অপেরার ঢং -এ অনেকবার সে সময় মঞ্চস্থও হয়েছিল। এমনকি ভারতের বাইরে পৃথিবীর শ্রোতাদের কাছে

পৌঁছে যায় এই নবজীবনের গান বন্ধু বিনয় রায়ের মাধ্যমে। বিনয় রায় ১৯৪৮ সালের পর এ দেশ ছেড়ে মস্কো রেডিয়োয় ভারতীয় বিভাগের প্রধান সংগঠকের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তিনি মস্কো রেডিয়োর মাধ্যমে নবজীবনের গান সম্প্রচার করতেন।

দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'নবজীবনের গান" ১৯৪৫-এ প্রকাশ পায়।

পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'যে পথেই যাও"। এই কাব্যগ্রন্থ ১৯৭৩ সালে প্রকাশ পেয়েছিল। অর্থাৎ দীর্ঘ ২৮ বছর পর। এই কাব্যে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র নগর সভ্যতার অন্তঃসার-শূন্যতা, নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনের অর্থহীনতার ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। 'অভিরাম পাল" কবিতায় অভিরামের জীবনের দুর্বহ গ্লানি ও যন্ত্রণার চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। দারিদ্র্যপীড়িত সংসারে সবই প্রত্যাশার বিপরীত ঘটে। স্ত্রী শ্বাসকষ্টে ভোগে, ছোট ভাই পুলিশের গুলিতে মারা গেছে, বোন বারাঙ্গনা হয়ে গেচে। ধার করে কোনোরকমে দিন গুজরান হয়। কিন্তু এত সব সমস্যা মাথায় নিয়ে যখন অভিরাম পাল প্রতিমা গড়তে শুরু করে তখন সে তন্ময় হয়ে যায় শিল্পের মধ্যে সব যন্ত্রণা ভুলে—

'ভুলে গেল আজ কাল পরশুর কথা, ভলে গেল।
অনশন অর্দ্ধাশন বিরোধ বিদ্রোহ আর মিছিলের সং
সব ভুলে গিয়ে আসে আশ্বিনের সোনার সকাল
ডাক সাজ প্রতিমায় রং দেয় অভিরাম পাল।'

এই পর্বে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র একটু যেন অন্যরকম। কেননা তাঁর যে স্বপ্ন নিয়ে তিনি আদর্শকে পাথেয় করে এগোচ্ছিলেন, স্বাধীন ভারতে এসে সেই স্বপ্ন পূরণের কোনও বাস্তবতা খুঁজে পাননি। তার ওপর গণনাট্য সংঘ গড়ে তোলার চেষ্টাও অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এ সময় তিনি কিছুদিন শিক্ষকতার পেশায় যুক্ত হন। ১৯৫৫ সালে সপরিবারে দিল্লি চলে যান। যোগ দেন সংগীত নাটক আকাদেমি ও ভারতীয় কলা কেন্দ্রে। কিছু কিছু পালা প্রযোজনা করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রামলীলা ও লম্বকর্ণ পালা। কবিতা লেখা থেকে দূরে সরে এসে শিল্পেই মনোবিবেশ করেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। চলচ্চিত্রে সংগীত পরিচালনা করেন ঋত্বিক কুমার ঘটকের স্মরণীয় দুটি ছায়াছবি 'কোমল গান্ধার' ও 'মেঘে ঢাকা তারা' -তে। সত্যজিৎ রায়ের তথ্যচিত্র 'রবীন্দ্রনাথ'-এও তিনি সংগীত পরিচালনা করেন। দিল্লিতে থাকাকালীন নতুন একটি শখ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তাহল পাখি দেখা ও পাখি চেনা। পাখি নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রমৈত্র নানা গবেষণাও করেছেন।

গায়ক ও সুরকার হিসাবে জ্যোতিরিন্দ্র মিত্রের পরিচিতি থাকলেও কবি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের অবদান প্রগতিশীল কবিতা আন্দোলনকে বিশেষ সমৃদ্ধিদান করেছে। দুঃখ দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন আজীবন। অগ্রন্থিত কবিতা ছড়ায় তার ছাপ রয়েছে। দুঃখদীর্ণ মানুষের নবজাগরণের ছবি 'নভেম্বর গুচ্ছ' কবিতায় তুলে ধরেছেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। মিছিল মুখর কলকাতা নগরীর বুকে মিলিটারির সঙ্গে সাধারণ মানুষের দ্বন্দ্ব সংঘাতের চিত্র উপস্থাপিত করেছেন এ কবিতায়—

'রক্তে আর আগুনে লাল
১৯৪৬ সালের নভেম্বর
ক্ষিপ্ত বহ্নি গ্রাস করে পথে পথে
অত্যাচারীর জয়রথ।
হাজরার মোড়ে মিলিটারী লরি জ্বলে
কাতারে কাতারে।'

'পটভূমি', '১৯৫০' প্রভৃতি কবিতাতেও সমসাময়িক পটভূমি স্থান করে নিয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র তাঁর একাধিক কবিতায় অস্থির সময়ের চিত্রকে যেমন স্থান দিয়েছেন তেমনি লাঞ্ছিত বঞ্চিত মানুষের সংগ্রামী মননের মধ্য দিয়ে সমস্যা উত্তরণের স্বপ্ন দেখেছেন। প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে নিছক কল্পনা বিলাসের লক্ষ্য নিয়ে তিনি কলম ধরেননি। মতাদর্শগত লড়াইকে তাঁর কবিতায় স্থান দিয়েছেন। প্রকৃত মানব কল্যাণকামী এই কবির জীবনাবসান হয় ১৯৭৭ সালের ২৫শে অক্টোবর। মৃত্যুর আগে তিনি দেখে গেছেন পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ১৯৭২ থেকে ৭৭ সাল পর্যন্ত যে রাজনৈতিক অস্থিরতা চলেছিল তার প্রত্যক্ষ ছবি। তিনি বেঁচে থাকলে তাঁর কবিতায় নিশ্চয় এই সময়কার চিত্র উঠে আসত। তবে মাত্র ছেষট্টি বছরের জীবনকালে যেভাবে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র শিল্প ও সাহিত্যকে মানুষের মঙ্গল কামনায় তুলে ধরেছেন তা পরবর্তীকালে শিল্পী ও সাহিত্যিকদের অনুপ্রাণিত করেছে।